e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৭, সংখ্যা: ৯ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | ডিসেম্বর ২০১৬

জানা অজানা

আখের ন্যানোকণা

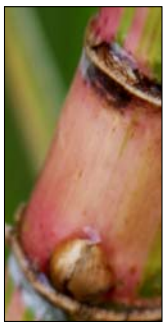

আলপিনকে না দেখেছে। আর আলপিনের ডগা কত যে ছোট তাও কে না জানে। অথচ আলপিনের ওই ক্ষুদ্র ডগাতে ১১,০০০ কোটি কার্বন কোয়ানটাম ডট সাজিয়ে রাখা যায়। সেগুলি হল কার্বনের ন্যানোকণা বা অনুকণারও অনু বলা যেতে পারে।

কার্বন কোয়ানটাম ডট কত ছোট তা বোঝাতেই ওই উদাহরণ দিয়েছেন চেন্নাইয়ের ম্যাড্রাস ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানী ডঃ রবিশঙ্করণ দেহসিঙ্গ। কিছুদিন ধরে উনি ও তাঁর সহ গবেষকরা আখ নিয়ে গবেষণা করছেন। বাজারে চিনির এখন খুবই দুর্নাম। পৃথিবীজুড়ে নানা রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য চিনিকে দায়ী করা হচ্ছে। ফলে চিনি খাওয়া ত্যাগ করছেন অনেকে। অনেক দেশ আবার চিনির ওপর কর বসানোর কথা ভাবছে। কিন্তু এর ফলে আখ চাষি আর চিনি ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। চিনির চল কমলে যে কাজ হারাবেন বহু মানুষ! তাই আখকে আর কী ভাবে কাজে লাগানো যায় সে নিয়েই চলছে ডঃ রবিশঙ্করণের গবেষণা। আখ থেকে উনি পেয়েছেন ওই কার্বন ন্যানোকণা। সেগুলি আলো সৃষ্টি করে এবং চিকিৎসার কাজে রোগীর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করার কাজে সহায়ক হতে পারে, এমনকী শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় বিশেষ ধরনের ওষুধও পৌঁছে দিতে পারে সেগুলি।

সূত্রঃ সায়েন্সডেইলি

ধনধান্যে ভরা ছিল সিন্ধু সভ্যতা

ধান চাষ ভারতীয়রা নিজেরাই শিখেছিল – নতুন আবিষ্কার বদলে দিচ্ছে পুরনো ধারণা

ভাত বাঙালির বড় প্রিয় খাবার। এক বেলা ভাত না খেলে কেমন যেন সম্পূর্ণ হয় না দিনের আহার। তাই তো বাঙালি নিজের সম্পর্কেই ঠাট্টা করে বলে 'ভেতো বাঙালি'। তবে সারা ভারতে বা ভারতীয় উপমহাদেশেই, ভাত – আর্থৎ চাল – প্রধান খাদ্যগুলির মধ্যে একটি। চাল এ দেশে নানা ভাবে খাওয়া হয় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত।

এত কাল মনে করা হত এ হেন প্রিয় চাল প্রাচীন কালে ভারতে উৎপন্ন হত না। ধারণা ছিল যে, বন্য ধানকে চাষযোগ্য করে তুলে তাকে খাওয়ার উপযোগী করে তোলা হয় চিন দেশে। সে দেশ থেকে নানা পথ ঘুরে চাল আসে ভারতে আজ থেকে ৪০০০ বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে ধান চাষ করতে শেখে এখানকার মানুষ। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে অতীতের কাহিনিটি ঠিক এ রকম নয়। বরং চিনে যে সময় ধান চাষ হচ্ছিল ভারতের সিন্ধু সভ্যতার মানুষজনও ঠিক সেই সময়ই ধান চাষে ব্যস্ত থাকতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে তাই জানা গেছে। যৌথ ভাবে গবেষণা করেছেন ইংলন্ডের কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি ও ভারতের বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির বিশেষজ্ঞরা।

আজকের উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবির জেলায় লাহুরাদেওয়া নামে এক জায়গা আছে। এক সময় সেটি ছিল সিন্ধু সভ্যতার অঙ্গ। সেখানে খনন কাজ (**ছবি**) চালিয়ে যে প্রাচীন নিদর্শণ মিলেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে যে খৃস্টপূর্ব ২০০০ সালে চিন থেকে ধান চাষের পদ্ধতি এখানে এসে পৌঁছনোর প্রায় আরও ৪৩০ বছর আগে – অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪,৫০০ বছর পূর্বে – ওই লাহুরাদেওয়ায় ধান চাষ হত। আরও জানা গেছে যে সিন্ধু সভ্যতায় একাধিক শস্য উৎপাদন করত সে কালের চাষিরা। গ্রীষ্মে চাষ হত ধান, বাজরা, বিন; আর শীতের সময় বোনা হত গম, যব আর ডাল। আর এই সবের জন্য ছিল বিশেষ জল সেচের ব্যবস্থা। মিশ্র কৃষি কাজের যে প্রমাণ সেখানে পাওয়া গেছে তা পৃথিবীর প্রাচীনতমগুলির মধ্যে পড়ে বলে জানিয়েছেন গবেকরা। "আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে সেখানে 'ওরিজা নিভারা' প্রজাতির বন্য ধানকে নিজস্ব উপায়ে কৃষিজাত করা হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ২০০০ সালে চিনের পদ্ধতি এসে পৌঁছনোর আগেই। জলসিক্ত জমিতে চাষ যেমন হত, তেমনই আবার হত শুষ্ক মাটিতে," বলেছেন গবেষক জেনিফার বেটস।

এবার ২ পাতায়

মঙ্গলে বরফ

মঙ্গল গ্রহের এক দিকে মাটির নীচে বিস্তর বরফ জমে আছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন আমেরিকার লেক সুপিরিয়রের মতো সেই জমে থাকা বরফের বিস্তৃতি। আর ওই হ্রদের আয়তন হল ৮৩,১০৩ বর্গ কিমি, যা কিনা এক ছোটখাট সমুদ্রের মতো। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সেই বরফ রয়েছে এমনই এক জায়গায় যেটি বেশ সমতল, আর কোথাও কোথাও মাত্র এক ফুট মাটি খুঁড়লেই নাগাল পাওয়া যাবে ওই বরফের। কোথাও বা যেতে

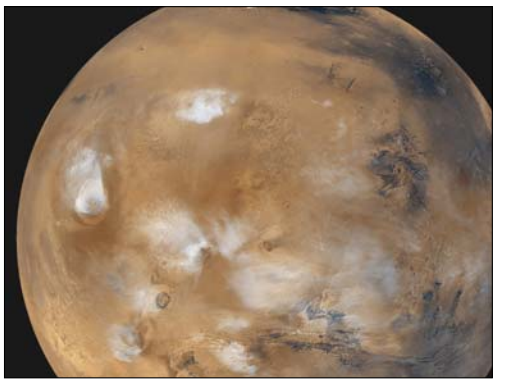

হবে ৩৩ ফিট গভীরে। বিজ্ঞানীরা বলছেন সেখানে যদি মহাকাশযান নামান যায়, তা হলে মহাকাশচারিদের জলের অভাব হবে না। মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যাবে বরফ আর সেই বরফ গলিয়ে মিলবে টলটলে জল।

দূষণের গ্রাসে দিল্লি থমকে গেল কয়েক দিন

শুধু বায়ু দূষণের কারণেই ইউরোপে প্রায় ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার মানুষের প্রতি বছর সময়ের আগেই মৃত্যু ঘটছে। এই সতর্ক বার্তা জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি বা ইএএ। বিবিসি ও এনডিটিভি'র প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, এই মহাদেশের ১০ শহরের মধ্যে ৯'রই বাসিন্দা দূষিত বাতাসেই নিশ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শহরবাসীরা এই দূষণ জনিত স্বাস্থ্যহানিরও শিকার হচ্ছেন বেশি। যাকে চোখে দেখা যায় না, যার গন্ধও পাওয়া যায় না, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে, বাতাসে ভাসমান সেই অতি সূক্ষ্ম কণাই এই ব্যাপারে আসল কালপ্রিট। কারণ তার মারাত্মক প্রভাবেই হৃৎপিন্ডের অসুখ হচ্ছে। বেড়ে চলেছে ফুসফুসের ক্যানসার ও অ্যাজমা।

New Indian Express

প্রসঙ্গত বায়ুদূষণে অবশ্য পৃথিবীর অন্যতম দূষিত রাজধানী হিসেবে ভারতের দিল্লি আগেই চিহ্নিত। কিছু সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে প্রতি বছর যেখানে অন্তত ১০ হাজার মানুষ আগে ভাগেই মারা যান দূষণের কারণে। বলা হচ্ছে, যে বাতাসে দিল্লিবাসীরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেন, তা দিনে ২০ সিগারেট খাওয়ার সমান। অর্থাৎ ততোটাই ক্ষতিকর। তার ওপর গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই দূষণ এমনই লাগামছাড়া পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, দূষণের মাত্রা কমাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রিকে ঘোষণা করতে হল - কয়েকদিনের জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হোক। বন্ধ রাখার হোক শহরের সব নির্মান কাজ এবং শহরের মধ্যে থাকা বদরপুর পাওয়ার স্টেশনটিও । কারণ তীব্র ধোঁয়াশার মোটা চাদরের নীচে তখন শহরের আকাশ ঢাকা। তাঁকে রাজ্যের অফিসযাত্রীদের কাছে এই আবেদনও জানাতে হল যে, তাঁরা যেন অন্তত দিন তিনেক রাস্তায় না বেরোন। গত ১৭ বছরে নাকি দিল্লিতে এমন ধোঁয়াশা হয়নি।

এবছর সেই দূষণ এতোটাই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে, ৫০০-৬০০ মিটার দূরের কিছুই দেখা যায় নি। বহু মানুষ ওই বায়ু দূষণে অসুস্থও হয়ে পড়েন। শহরের বাতাস এমনিতেই ভারাক্রান্ত থাকে বিপুল যানবাহন, নির্মান কাজ আর কলকারখানা থেকে ঘটা দূষণে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পার্শ্ববর্তী পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে চাষের ক্ষেতে পোড়ানো জঞ্জাল থেকে ভেসে আসা দূষিত কণাও। ধান, গম উঠে যাওয়ার পর আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি পরবর্তী চাষের মাটি তৈরি করার জন্য চাষিরা ক্ষেতের জঞ্জাল সাধারণত পুড়িয়ে দেন। তার থেকে ঘটে দূষণ। রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে আসা যে দূষণে এবছর রাজধানীর শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়।

প্রধানত যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়াই দিল্লির বাতাসকে বিষিয়ে তুলছে। প্রতি রাতে প্রায় ৮০ হাজার ট্রাক শহরে ঢোকে এবং শহর থেকে বেরিয়ে যায়। যেগুলির মধ্যে বহু গাড়িই দুই দশকের থেকেও পুরোনো এবং যেগুলি চলে কেরোসিন ও ডিজেল মেশানো জ্বালানিতে।

এছাড়া শহরের মধ্যেই বিদ্যুৎ প্রকল্প থাকায় তার থেকেও ব্যাপক দূষণ ঘটছে। যদিও আমাদের দেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণের নানা আইন আছে, আইন ভাঙলে জেল জরিমানার শাস্তিও আছে। কিন্তু দূষণকারীরা সেইসব মানছে কই? আর কেই বা কাকে শাস্তি দিচ্ছে? অথচ দিল্লিতে এই দূষণের কারণে বিপজ্জনক ভাবে ফুসফুস জনিত অসুখ বাড়ছে, বিশেষত শিশুদের।

কী গ্রীষ্ম, কী শীত ফসল ফলত সারা বছর

১ পাতা থেকে

সিন্ধু সভ্যতার চাষবাস ছিল সে কালের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার কৃষিকাজের থেকে অনেকটাই আলাদা। মানব সভ্যতার আর এক পীঠস্থান মেসোপোটেমিয়ায় (আজকের ইরাক অঞ্চল) চাষ হত শীতের মরশুমে। ফলান হত মূলত গম আর যব। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত সেখানকার মানুষ। অপর দিকে চিনে, যা ছিল সভ্যতার আরও একটি উজ্জ্বল ক্ষেত্র, সেখানেও চাষ হত একবার – বর্ষার দিনগুলিতে। ফলান হত প্রধানত ধান আর বাজরা, যা ঘরে ঘরে মজুত করা হত সারা বছরের চাহিদা মেটাতে। কিন্তু গবেষক বেটস বলছেন যে সে সময় সিন্ধু সভ্যতায় চাষ হত সারা বছর ধরে। কি গ্রীষ্ম কি শীত, আজকের পাকিস্তান আর ভারতের এক বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিন্ধু সভ্যতায় চাষের ক্ষেত ফাঁকা পড়ে থাকত না। পৃথিবীর অন্যান্য নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা জনপদে মানুষ সারা বছর চাষ করতে শেখে অনেক পরে ।

makemefeed.com

রাখিগঢ়ির প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ক্ষেত্র

যে মুগ, অরহড় আর ছোলার ডাল আজ আমরা খেয়ে থাকি, তাও উৎপন্ন হত সেই সিন্ধু সভ্যতার যুগে। দিল্লি থেকে ১৫০ কিমি দূরে হরিয়ানার এক নিরিবিলি গ্রাম রাখিগঢ়ি **(ছবি)**। সেখানে পাওয়া গেছে ওই সব ডালের প্রাচীন নমুনা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলি প্রায় ৪,৮৯০ বছর পুরনো। এমনকী মশলার নমুনাও পাওয়া গেছে খনন কাজের ফলে। বলা হচ্ছে রাখিগঢ়িতে এক জনপদ গড়ে উঠেছিল, যার আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ৪০,০০০। গ্রামে ফলান ফসল চাষিরা ওই শহরে এনে বাজারে বিক্রি করতেন বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। মনে করা হয় সে বাজার গুলি ছিল বেশ জমজমাট, কেনা বেচা হত বিস্তর।

এ বললে হয়ত ভুল হবে না যে সেই সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই ডাল-ভাতে অভ্যস্ত এই উপমহাদেশের বাসিন্দারা। তাই বোধহয় এখনও ন্যুনতম ডাল-ভাত হলেই দিন চালিয়ে নিতে পারেন এখানকার অগনতি মানুষ। **সূত্রঃ কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস রিলিজ, ইউরেকাঅ্যালার্ট মারফৎ**

স্কাঙ্ক

অনেকটা আমাদের গৃহপালিত বেড়ালের মতো। তবে স্কাঙ্কদের বৈশিষ্ট্যই হল সাদা কালো লোমে ঠাসা শরীরে বিশাল লোমষ একটি লেজ এবং আত্মরক্ষার জন্য তার উৎকট বিষাক্ত গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। শিকারিকে দূরে রাখতে প্রাথমিক ভাবে নানা রকম সঙ্কেত সে পাঠায়। কিন্তু শিকারি তা অগ্রাহ্য করে তার দিকে ধেয়ে এলে শেষ অস্ত্র হিসেবে লেজ তুলে তার চোখে মুখে পিছন থেকে ১০ ফিট পর্যন্ত দুর্গন্ধের ফোয়ারা ছিটিয়ে দেয়। আর টিয়ার গ্যাসের মতো তাতে শিকারের চোখ মুখ তখন জ্বলতে থাকে। সাধারণত তারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে দ্বদ্ব এড়িয়েই চলে। নিঃসঙ্গতাপ্রিয় এই স্কাঙ্করা একাধারে মাংসাশী ওতৃণভোজিও। দিনে ঘুমোয় আর রাতে শিকার ধরে বেড়ায়। বন্য স্কাঙ্করা সাধারণত বছর তিনেক বাঁচে।

পুষ্টির শক্তিগৃহ, আদি নিবাস মধ্য আমেরিকা

জেনে রাখা ভাল

তাকে পুষ্টির শক্তিগৃহ বলা হয়। তার আদি নিবাস মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল। মনে করা হয় ব্রেজিলেই তার প্রথম চাষ শুরু হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সে পর্তুগিজদের হাত ধরে ছড়িয়ে পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশে। এবং ভারতে সে পৌঁছে ছিল স্প্যানিশদের হাত ধরে। হ্যাঁ, আমাদের অতি পরিচিত সেই পেয়ারা সম্পর্কে আরও যা জানা যায় -

● তার ওষধি গুণাগুণ, লোক চিকিৎসায় তার ব্যবহারের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে ১৯৫০ সাল থেকে পেয়ারা সম্পর্কে নানা গবেষণা শুরু হয়।

● বানিজ্যিক হারে পেয়ারার চাষ শুরু হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, হাওয়াই, ক্যারিবিয়ান, ফ্লোরিডা ও আফ্রিকায়।

● প্রতিদিন আমাদের যতটা সি ভিটামিন প্রয়োজন, পেয়ারাতে তার ৩ গুণ থাকায় স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারি ফলেদের মধ্যে অন্যতম বলে গন্য হয় সে।

● প্রায় ১৫০ রকমের পেয়ারা

আছে। একটি কমলালেবুর থেকে ৫ গুণ বেশি সি ভিটামিন থাকে একটা পেয়ারায়।

● পেয়ারা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হওয়ায় শুধু ক্যানসারই নয়, নানা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতায় সে বলীয়ান।

● পটাশিয়াম সমৃদ্ধ এই মিষ্টি ফলটি হার্ট সহ শরীরের সমস্ত মাস্‌ল বা পেশিকে কার্যকর ও সজীব রাখতে সাহায্য করে।

● সি ছাড়াও ভিটামিন ই, কে, বি৬ এবং কপার, মেঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম'র মত নানা খনিজ আছে যারা রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

● পেয়ারায় প্রচুর আঁশ থাকায় দেহের সুগার কমিয়ে ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

● বেটা ক্যারোটিন,ভিটামিন এ' আর প্রচুর ভিটামন সি থাকায় এই ফলটি চোখ, চামড়া সুস্থ রাখতে, এমনকী দেহে বয়সের লক্ষণ ফুটে ওঠার গতিকেও ধীর করে দিতে সাহায্য করে।

● পেয়ারা গাছের ছাল ও পেয়ারা পাতা অনেকেই বিকল্প দাঁতের মাজন হিসেবেও ব্যবহার করে।

সূত্রঃ ফুডফাই.কম, উইকিফিটনেস.কম

এখন বারো মাসই পেটপুজো

মাছভাত, বিরিয়ানি, চাও, চপ, মোগলাই

চিলিচিকেন, ফিশফ্রাই, রোল আরও যা যা চাই

খাই খাই রেস্টুরেন্ট

৩৪১/২ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, শিবপুর, হাওড়া

(নবান্ন বাস টার্মিনাসের কাছে)

ফোন: ৮৪৪৪০১২১৭৭/৮০১৩৭৩৩৬৫০

সুন্দর ঘন লোমই তাদের বিপন্ন করেছে

আর কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর তার মতো এমন ঘন সুন্দর লোম হয় না। কিন্তু ওই সুন্দর লোমের আকর্ষণই যে 'সি-অটার'তথা সামুদ্রিক ভোঁদড়দের মৃত্যু দূত হয়ে আসে। লোম ব্যবসায়ীদের চাহিদা মেটাতে লক্ষ্য হয়ে ওঠে তারা চোরা শিকারিদের। আবার চিঙড়ি, অক্টোপাস, স্কুইড ও কাঁকড়া, ঝিনুকের মতো নানা সামুদ্রিক শেল ফিশ যা মানুষের খাদ্য, তাদেরও খাদ্য আবার সেই সবই। ফলে একই জলে খাদ্যের সন্ধানে মৎস্যজীবী ও সি অটার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অঘোষিত লড়াই। আর বলা বাহুল্য যে, মানুষের শক্তি বুদ্ধির কাছে এই জলজ প্রাণীটি নিতান্তই দুর্বল। ফলে মানুষের কৌশলে সে ধরা পড়ে আর নিহত হয়। জানা যায় হাজার বছর ধরে এই পরিস্থিতির শিকার হতে হতে তারা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সেই ১৭৫১ সালে প্রথম জর্জ স্টেলার'র লেখায় এই সামুদ্রিক ভোঁদড়দের সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ছোট সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম এই সামুদ্রিক ভোঁদড়দের উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়। তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই জলে কাটে। এমনকী জল ছেড়ে একবারও ডাঙায় না

বিপন্ন যারা

এসেও তারা সারা জীবন দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। জলে চিৎ হয়ে ভেসে থাকা এই প্রাণীটি ঘুমোয়ও চিৎ হয়েই, পরস্পরের হাত ধরে। সি অটাররাই একমাত্র ভোঁদড় যারা জলের মধ্যে সন্তানের জন্ম দেয়। এবং নিজের বাচ্চাদেরও চিৎ অবস্থায় বুকের ওপর রেখে পালন করে।

সাগরের গভীরে ঝাঁপ মেরে তারা খাবার খুঁজে আনে। জলের মধ্যে ৫ মিনিট প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে। ভাসমান ভোঁদড় বুকের ওপর পাথর রেখে তাতে ঠুকে ঠুকে খোলস থেকে মাছ বার করে খায়। এরা একমাত্র সামুদ্রিক প্রাণী যারা জলের তলায় পাথর তুলে বা রীতিমত তাকে সরিয়ে খাবার খোঁজে এবং দাঁত দিয়ে নয়, সামনের থাবা দিয়ে মাছ ধরে। মজার ব্যাপার তাদের সামনের পা থেকে বুক পর্যন্ত একটা চামড়ার থলি থাকে। জলের তলায় খোঁজার সময় খাবার ওই থলিতে জমা করে। সেই থলিতে পাথরও জমা রাখে। এবং জলের ওপরে ভেসে উঠেই থলি থেকে খাবার বার করে প্রয়োজনে ওই পাথরের সাহায্য নিয়ে। প্রতিদিন তাদের দেহের ২৫-৪০ শতাংশ ওজনের সম পরিমান খাদ্য তাদের খেতে হয়।

একা একা খাবারের খোঁজ করলেও এই ভোঁদড়রা দল বেঁধেই থাকে। খাওয়া, ঘুম, প্রজনন, সন্তান পালন - সবই ওই জলে। সাধারণত একটি সন্তানেরই জন্ম দেয় কদাচিৎ ২ হলেও বাঁচে ওই একটাই। গড়ে পুরুষদের আয়ু ১০-১৫ বছর। আর মেয়ে ভোঁদড়রা বাঁচে ১৫-২০ বছর।

তারা এমনিতে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে এবং নিজেদের লোম পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে তারা খুবই সচেতন। কারণ শরীর গরম রাখার জন্য লোমের ভেতর দিয়ে হাওয়া চলাচল প্রয়োজন। লোম নোঙরা থাকলে তাতে ব্যাঘাত ঘটে। দেখা গেছে জাহাজ থেকে চুইয়ে পড়া তেলে অন্য যে কোনও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর থেকে তাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই সি-অটাররা। ওই তেল তাদের লোমে জড়িয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। তাই খাওয়া আর ঘুম ছাড়া সব সময়ই তাদের গায়ের লোম পরিষ্কার করতে দেখা যায়।

মেরু অঞ্চলে মেরু ভালুকদের মতোই সি অটাররা তাদের ইকো সিস্টেম বা প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। হলে কি হবে, যে লোম তাদের বাঁচিয়ে রাখে, সেই লোমের জন্যই তার শিকার হয়। এবং জানা যায় ওই শিকার হতে হতেই একদা তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ থেকে ২-৩ হাজারে নেমে এসেছিল। পরে অবশ্য শিকার নিষিদ্ধ হওয়ায় বিংশ শতাব্দীতে তাদের সংখ্যা অনেকটাই বাড়ে। কিন্তু তবুও তারা এখনও বিপন্নের তালিকাতেই রয়ে গেছে।

সূত্র: উইকিপিডিয়া, ওয়ার্ল্ডওয়াইল্ডলাইফ.অরজ

উড়ানের গতিতে প্রথম স্থানে উঠে এল এক বাদুড়

উড়ন্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী হিসেবে প্রথম স্থান এতদিন অধিকার করেছিল সুইফ্‌ট প্রজাতির পাখি। ছোট এই পাখি বাতাস চিরে ঘন্টায় ১১০ কিমি বেগে সোজাসুজি উড়ে যেতে পারে। তাই বোধহয় এ দেশের মারুতি কম্পানি তাদের একটি গাড়ির নাম দিয়েছে 'সুইফ্‌ট'। কিন্তু সম্প্রতি ওই পাখিটিকে পেছনে ফেলে এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছে অন্য এক প্রাণী।

জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ও মার্কিন

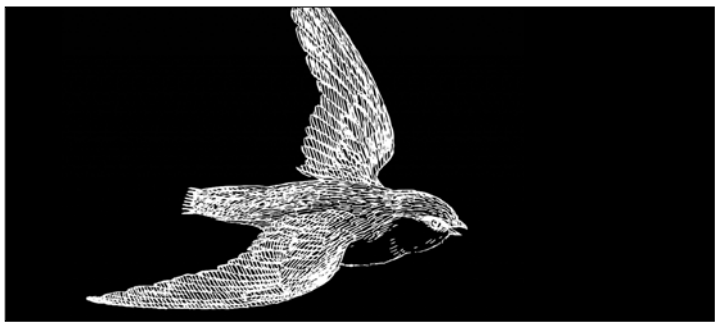

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা বসচেয়ে গতিসম্পন্ন উড়ন্ত প্রাণীটিকে চিহ্নিত করেছেন কিছু দিন আগে। প্রাণীটি পাখি নয়, এক প্রজাতির বাদুড়। থাকে ব্রাজিলের জঙ্গলে। তার সোজা উড়ানের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ১৬০ কিমি। তাদের শরীরের গঠন আর ডানার আকৃতি তাদের সবচেয়ে দ্রুতগামী করেছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে পেরেগ্রিন ফ্যালকন, যা এক ধরনের বাজপাখি, যখন

আকাশে অনেক উঁচু থেকে নীচে ছোঁ মেরে শিকার ধরার জন্য নামতে থাকে, তখন তার অবতরণের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৩০০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে।

গবেষকরা বলেছেন মাটি থেকে বাতাসবাহিত হাওয়া, হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলা ও অবতরণ করায় পাখিদের জুড়ি নেই। তাই বিমান গবেষকরা এখনও পাখিদের উড়ান বিশ্লেষণ করে চলেছেন আরও উন্নত প্লেন তৈরি করার জন্য।

সূত্র: ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি

নিরাপদ খাদ্যের মেলায় আতার আইসক্রিম, টক ঢ্যাঁড়শের চা

কাঁঠাল, আতা, তরমুজ কিম্বা কদবেল, করমচা বা ডাবের শাঁসের আইসক্রিম খেয়েছেন কখনও? খাওয়া তো দূরের কথা আমি নিশ্চিৎ, আমার মতো বেশিরভাগ মানুষেরই এই ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না। কিন্তু গত নভেম্বরের ২৭ তারিখে কলকাতায় বোসপুকুরে ধর্মতলা তরুণ সঙ্ঘ'র মাঠে ২ দিন ব্যাপী একটি মেলায় হাজির হয়ে সেই অত্যাশ্চর্য ফ্রুট আইসক্রিম, থুড়ি ফ্রুট আইস ক্যান্ডি রীতিমতো টেস্ট করে দেখার সুযোগ ঘটল। সুযোগ হল টক ঢ্যাঁড়শের চা, নারকেল গাছের ফুল থেকে তৈরি রস এবং তার থেকে তৈরি গুড়'র **(মাঝের ছবি)** মতো এমন সব অসাধারণ অভাবনীয় জিনিস আস্বাদনের।

ওই বসুন্ধরা উৎসব সাধারণ মেলা বা উৎসবের থেকে একটু আলাদা ছিল। আসলে আমরা নিত্যদিন যে সব বিষাক্ত খাবার খেয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, যেভাবে খাদ্য বৈচিত্র ধ্বংস হয়ে চলেছে, যে সব দেশজ শস্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সেই সব কিছু সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্য ছিল এই উৎসব বা মেলার। লক্ষ্য ছিল পরিবেশবান্ধব জীবনধারা, জীববৈচিত্র রক্ষা ও বিষমুক্ত খাদ্যকে কীভাবে সহজলভ্য করা যায় তার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোও। সুন্দরবনের সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লক থেকে অপর্ণা দাস, বর্ধমানের আউসগ্রাম থেকে কুহেলি ভট্টাচার্যরদের মতো রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বহু উৎপাদক এই উৎসবে নানা রকমের বিষমুক্ত জৈব শস্য, জৈব ফসল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কালো,বাদামি কত রকমের চাল, ডাল, তেল, মধু, গুড়, মশলা, ঘি, জ্যাম, আচার, পাটালি কি ছিল না সেখানে।

ছিল কীভাবে ছাদে সহজে

শাক - সবজির বাগান করা যায়, কীভাবে চায়ের পাতায় ভেজাল আছে কিনা যাচাই করা যায় নিজেই, কীভাবে টক ঢ্যাঁড়সের পাপড়ি দিয়ে অপূর্ব চা বানানো যায় - হাতে কলমে তার শিক্ষাও। আয়োজক সুজিত মিত্র'র কাছে শুনলাম, ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার বহু বছর ধরেই জেলায় জেলায় ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের জৈব সারের সাহায্যে জৈব ফসল উৎপাদনে উৎসাহ ও সহায়তা দিয়ে চলেছে। তারই ফসল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আজ ১০ হাজার কৃষক পরিবার অরগানিক বা জৈব চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

এখানেই জানলাম, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানী ড: দীপক ঘোষ'র চেষ্টায় 'নীরা' নামে আশ্চর্য একটি পানীয় তৈরি হয়েছে নারকেল গাছের ফুল থেকে। যা থেকে তৈরি হচ্ছে গুড়ও। চেখে দেখলাম এই নতুন পানীয়টি অত্যন্ত সুস্বাদু। শুনলাম অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, নানা খনিজ ও ভিটামিন'এ ভরপুর ও বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। মনে হচ্ছিল এখানে না এলে এমন নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনের কথা অজানা থেকে যেত। অজানা থেকে যেত এমন দেশজ ফল সবজি থেকে এমন অভিনব, অসাধারণ সব নতুন আবিষ্কারের কথাও।

মালবী গুপ্ত

Enjoy Poems in Translation
(Bengali to English & Vice Versa)

- **Beauteous Bengal** (Rupasi Bangla - Jibanananda Das) (Versified in English) -- Rs 150/-
- **Brajangana Kabya** (Michael's) (English Verse) with an extensive note on Calcutta in Michael's time -- Rs 200/-
- **A Random Collection of Bengali Poems** (from 150 yrs of poems in Bengali) (Versified in English) -- Price not stated.
- অনুবাদ বিচিত্রা (from 600 yrs of poems in English (versified in Bengali) -- Rs 250
- Also: WIDE ANGLE VIEW (A collage of quotations, gathered over 50 years on varied subjects) -- Rs 200/-

Author: Sarbeswar Jana, CD 176, Sector 1, Salt Lake City, Kolkata - 64. Ph: 9748974632/033 23372319/9433033102
Available at: Abhijit Book Stall No. 26, College Square, Kolkata - 73. Ph: 9830202939

মাসিক পত্রিকা "জীবনের পরিবেশ" পড়ুন ও আপনার কোন লেখা পাঠাতে পারেন

পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের সমস্যা-ক্লিষ্ট আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা জরুরী একাট বিষয় পরিবেশ সচেতনতা। জীবাশ্ম এবং পরমাণু নির্ভর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য সূর্যকিরণ, বায়ুবেগ ও অন্যান্য পুনর্নবীকরণ যোগ্য প্রাকৃতিক শক্তির উদ্ভাবনে ও প্রক্রিয়া করণে স্বল্প ব্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বিপদ ঘনায়মান সর্বত্র। অরণ্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও প্রাণী সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ভূগর্ভ জল নিঃশেষ প্রায়। আগামী দিনে জলের জন্য যুদ্ধ হতে পারে। এই সব আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মহল ও জাতি সঙ্ঘ। জল বায়ুর পরিবর্তন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলি আতঙ্কিত।
তবু এখনও পথ আছে। যা কিন্তু কেবল বিজ্ঞান ও গবেষণা নির্ভর নয়। সর্ব সাধারণকে সজাগ হতে হবে। অগ্রসর হতে হবে সকলকে। সেই সাধনায় উৎসর্গীকৃত কিছু মানুষ - যাঁদের কর্ম প্রচেষ্টায় এই মাসিক পত্রিকা। বাৎসরিক সডাক : ৪০০ টাকা।

Jibaner Paribesh (Enviornmental Life)
(Bilingual Monthly Journal - Regn No. 0370, ISSN 2348-8781)
Email: greencircle_kolkata@yahoo.co.in
Call: 9831333322
Publisher: Dr. Asit Kr. Roy, 52 d/7, Babubagan Lane, Kolkata 700031

দেওয়াল লিখন

ভারতে এখন মোটা ছেলেমেয়ের সংখ্যা ১.৫ কোটি। ২০২৫ সালে তা হবে ৭.০ কোটি

ডাউন টু আর্থ

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: Decmber 1, 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● পৃথিবীর বৃহত্তম বাদুড় কলোনিটি টেক্সাসের ব্রেকেন কেভ'এ। মনে করা হয় সেখানে প্রায় ২ কোটি বাদুড়ের বাস।

● কিছু কিছু প্রজাতির লবস্টার বা গলদা চিঙড়ি আছে যারা ৫০ বা তারও বেশি বছর বাঁচে।

● পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশই আংশিক বা প্রায় পুরোপুরিই মরুঅঞ্চল।

● নাহ, কোনও ভাবেই কেপ বাফেলোকে পোষ মানানো যায়নি। সারা আফ্রিকায় তাকে 'কালো মৃত্যু'বলা হয়। কারণ এই মহাদেশে প্রতি বছর তার আক্রমনে নিহত মানুষের সংখ্যা অন্য যে কোনও বড় প্রাণীর দ্বারা নিহত মানুষের থেকে বেশি।

● নিউজিল্যান্ড'এ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হুইয়া পাখির একটি মাত্র পালকের দাম অকশনে উঠেছিল ১০ হাজার ডলার মানে প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

আগুনের চক্রের ওপর বসে আছে জাপান

জাপানে ভূমিকম্প লেগেই থাকে। মাঝেমাঝেই সে দেশের কোনও না কোনও দ্বীপ কম বেশি কেঁপে ওঠে। সেখানকার মানুষজন ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত থাকেন। বাড়িঘর রাস্তাঘাট এমনভাবে তৈরি যাতে ক্ষয় ক্ষতি হয় কম। তবে কখনও কখনও মাটির কম্পন বিধ্বংসি হয়ে ওঠে বৈকি। যেমন হয়েছিল ২০১১ সালে। প্রবল ভূকম্পন সৃষ্টি করেছিল ততোধিক ভয়ঙ্কর সুনামি। বহু মানুষ মারা গিয়েছিলেন। ফুকুসিমা পরমাণু তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার চুল্লি ফেটে গিয়ে সারা বিশ্বে ভয়ঙ্কর তেজষ্ক্রিয় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। প্রযুক্তিবিদদের মরণপণ চেষ্টায় সে দুর্ঘটনা অবশ্য এড়ান যায়। প্রশ্ন হল, জাপানে ঘনঘন ভূমিকম্প কেন হয়? কারণ, বলা হয় আগুনের চক্রের ওপর বসে আছে জাপান। সে চক্র চোখে দেখেনি কেউ। তবে ভূবিজ্ঞানী-রা বলেন প্রশান্ত মহাসাগরের

তলায় ঘোঁড়ার পায়ের নলের আকারের এক সুবিস্তৃত এলাকাজুড়ে চলছে ভাঙ্গাগড়া। আর জাপান সেই চক্রের এমনই এক স্থানে অবস্থিত যেখানে পৃথিবীর ভূখন্ডের একাধিক প্লেট একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। সেই ঘর্ষণের মাত্রা যখন হঠাৎই বেড়ে যায় তখন ভেঙ্গে যায় ভূখন্ডের কোনও এক অংশ, ধ্বসে যায় সমুদ্রতল, আর কয়েক মুহুর্তের জন্য কেঁপে ওঠে জাপানের কোনও না কোনও অঞ্চল। যত দিন না সেই আগুনের চক্রে ভাঙ্গাগড়া শেষ হবে, ততদিন জাপান থেকে থেকেই বড়সড় ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)

c w_exi Wv qwi cvIqv hvq

ক্যুইজ?!?!

1 | সমুদ্রের জল বিষুব রেখার কাছাকাছি যতটা লবনাক্ত, দুই মেরুর কাছে ততটা নয় কেন?

2 | সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাতে আজকের পৃথিবীত এদের মধ্যে কোন গ্যাসটি সব থেকে বেশি?
(ক) অক্সিজেন (খ) কার্বনডাই অক্সাইড (গ) নাইট্রোজেন (ঘ) হাইড্রোজেন

3 | কত ন্যানোমিটারে এক সেন্টিমিটার?
(ক) ১০০,০০০ (খ) ১,০০০,০০০ (গ) ১০,০০০,০০০ (ঘ)১০০,০০০,০০০

4 | পৃথিবীর বয়স কত বছর?
(ক) সাড়ে চার লক্ষ (খ) ৪৫ লক্ষ (গ) ৪৫,০০০ (ঘ) সাড়ে চার'শ কোটি

5 | সিঙ সিঙ কি বা কে?
(ক) প্রথম পান্ডা যাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল (খ) পাঞ্জ ভাষাতে শিখ ধর্মাবলম্বী (গ) নিউইয়র্ক'র জেলখানা (ঘ) সিঙ্কারা, এক বিশেষ প্রজাতির হরিণের আর এক নাম

6 | গত শতাব্দীর প্রথমে কোথায় বোয়ার যুদ্ধ হয়েছিল?
(ক) হল্যান্ড (খ) দক্ষিণ আফ্রিকা (গ) শ্রী লঙ্কা(ঘ) ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমার

7 | ১৯০৩ এ ভিন্ন দেশ হওয়ার আগে পানামা কোন দেশের অংশ ছিল?
(ক) ভেনিজুয়েলা (খ) কলম্বিয়া (গ) ইকুয়েডর (ঘ) ব্রেজিল

8 | সারা বিশ্বে বুনো গাধার সংখ্যা কমতে কমতে এখন ৬০ বা তারও কম। গৃহপালিত গাধার সংখ্যা আনুমানিক কত?
(ক) ১০ কোটি (খ) ২০ কোটি (গ) ৩ লাখ (ঘ) সাড়ে চার কোটি

9 | শাহজাহানাবাদ প্রাসাদ আর দুর্গ এখন কি নামে পরিচিত?
(ক) লাল কেল্লা (খ) আগ্রা ফোর্ট (গ) বুলন্দ দরওয়াজা (ঘ) ইন্ডিয়া গেট

10 | নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কাকে মোক্ষদেব উপাধি দিয়েছিল?
(ক) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (খ) হিউএন সাঙ (গ) অমর্ত্য সেন (ঘ) সম্রাট অশোক

উত্তর: ১/ মেরু অঞ্চলে বরফ আর তুষার নোনা ভাবটা কমিয়ে দেয়; তার ওপর বিষুব রেখার কাছাকাছি তাপের জন্য জল বাষ্প হয়ে যায়, ফলে নোনা ভাবটা বাড়ে; ২/গ; ৩/গ; ৪/ঘ; ৫/গ; ৬/খ; ৭/খ; ৮/ঘ; ৯/ক; ১০/খ

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট, ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড, কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com